ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 867-873
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.078

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ : একটি সমীক্ষা

অঞ্জন পাল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লামডিং কলেজ, লামডিং, আসাম, ভারত*

Received: 17.03.2025; Send for Revised: 18.03.2025; Revised Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Literature is the mirror of society. Therefore, different aspects of society are always highlighted by different writers in literature. Ramapada Chowdhury was one such a notable writer of Bengali literature who had highlighted various aspects of society such as human values, despair, crisis etc. in his works. He was basically personification of the middle class, yet he did not forget to describe to the so-called lower class such as indigenous people (Adivasi) of the society. Although he appeared in Bengali literature as a short story writer, he also gained considerable fame as novelist. In fact, he had thoroughly discussed the issues of lower class, middle class, position of women in society etc. in his fiction. Ramapada Chowdhury (28.12.1922 – 29.07.2018) was born in Kharagpur West Bengal. His father was Taraprasanna Chowdhury and mother Durgasundari Devi. His father worked in the railways and thus the family often moved from one place to another. That is why he had the opportunity to expose the life of several deferent parts of India. Moreover, during his childhood period Ramapada with his friends in the evening often moved to nearby villages to observe the lifestyle of Adivasi people. In the article I will try to discuss on three novels (Dwiper Nam Tia rang, Aranya Adim, Dubsantar) of Ramapada Chowdhury, where he has exposed the life of indigenous communities.

Keywords: *Indigenous community, Subaltern people, Lifestyle, Culture, Colonialism, Middle class, Fiction.*

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম রূপকার রমাপদ চৌধুরী (২৮.১২.১৯২২-২৯.০৭.২০১৮)। মূলত: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রূপকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রমাপদ চৌধুরী পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর ছোট গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আমরা অন্ত্যজ-আদিবাসী-কোলিয়ারিদের জীবনচিত্র খুঁজে পাই। শৈশবকালে খড়্গপুরে থাকাকালীন এবং পরবর্তীতে কোলিয়ারিতে কাজ করার সূত্রে তিনি আদিবাসী জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। খড়্গপুরে থাকা কালীন লেখক ও তাঁর কয়েক বন্ধু মিলে প্রায়সময়ই শহর থেকে অনেক দূরে গ্রাম্য প্রকৃতি উপভোগ করতে সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতেন। কখনো কখনো চলে যেতেন দূরে ছোট্ট সাঁওতাল পল্লীতে সেখান কার আদিবাসীদের জীবন যাপন দেখতে। 'লেখালেখি' নামক স্মৃতিকথায় লেখক উল্লেখ করেছেন –

> "ট্যাংরার হাটের পাশেই তখন একটা ছোট্ট সাঁওতাল পল্লী ছিল। শাল কাঠির দেওয়ালে মাটি লেপা আর হোগলার ছাউনি দেওয়া। কিন্তু কী সুন্দর ছিমছাম। তকতকে উঠোন মাঝখানটায়, আর চারপাশে ঘরগুলো! উঠোনে মোরগ মুরগি চরত, মোরগগুলো যাত্রাদলের দাম্ভিক রাজার মতো

ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতো আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ত। সাঁওতাল মেয়েপুরুষ বাচ্চার দলকে বেশ লাগত আমার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও সাইকেলটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে চবুতরার ঢেঁকিতে বসে বসে দেখতাম তাদের। কী নিটোল স্বাস্থ্য পুরুষগুলোর। ঝাকড়াঁ- ঝাকড়াঁ বাবরি চুল। মেয়েদের গাল আর কপাল থেকে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে, হাত-পা যেমন সুডোল তেমনি চকচকে। কিন্তু আমাদের বয়সী বাচ্চাগুলোকেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত। কেমন মোলায়েম চেহারা, টানা টানা ঠান্ডা চোখ, আর আমাদের দিকে তাকাত যেন ভয়ে ভয়ে। ছেলেগুলোর হাতে সবসময়ই হয় তীরধনুক, নয়তো বাঁশি।”[১]

বাবা তারা প্রসন্ন চৌধুরীর চাকরির সুবাদে রাঁচী, হাজারিবাগ, রায়পুর, বিলাসপুর বিশাখাপত্তনম, গোয়া, গোলকুন্ডা, উদয়পুর ইত্যাদি বহু জায়গার সঙ্গে রমাপদ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল। এছাড়াও ভ্রমণ পিপাসু রমাপদ চৌধুরী দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন রাঁচী, পালামৌ, হাজারিবাগ ইত্যাদি আদিবাসী জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে। খুব কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মুন্ডা, ওরাং, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জন জীবনকে। তাদের প্রাত্যহিক জীবন, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি রূপ পেয়েছে তাঁর আদিবাসী জীবননির্ভর গল্পগুলোতে। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলোতে আদিবাসী অন্ত্যজ কোলিয়ারি জীবন ফিরে ফিরে এসেছে।

আদিম অধিবাসীদের অনাড়ম্বর জীবনধারাকে কেন্দ্র করে রচিত রমাপদ চৌধুরীর বিখ্যাত উপন্যাস ‘দ্বীপের নাম টিয়ারঙ’ (১৯৫৭)। উপন্যাসটির উৎস হিসেবে ঔপন্যাসিক একটি পুরনো ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসটিতে আদিম কৌমধারার সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দ্বন্দ্বের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে কর্মচ্যুত দ্বীপের মানুষের জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা। জনজাতি অধ্যুষিত দ্বীপের মানুষের জন্য সাহেব কোম্পানি বাণিজ্যের হাত বাড়িয়ে দিল। এরপর শুরু হল অরণ্য ধ্বংস এবং বণিকের মুনাফা বৃদ্ধির ফলে দ্বীপের অরণ্যবাসী মানুষেরা পরিণত হল শোষিত শ্রমিকে।

টিয়ারঙের অধিবাসীদের জীবন যাপন সাধারণমানের। তারা প্রায় সকলেই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ডিঙ্গি নৌকায় মাছ ধরে, চাষবাস করে, নারকেল পাতার ছাউনি দিয়ে ঘরবাড়ি বানায়, মদ চোলাই করে। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র ব্যবসা করে, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরি করে, ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ পুড়িয়ে কলিচুন প্রস্তুত করে এবং তা গঞ্জে গিয়ে বিক্রি করে। টিয়ারঙের অধিবাসীদের জীবনেও একসময় আধুনিকতার স্পর্শ লাগে। কাঠের ব্যবসা করার জন্য স্টিফেন্স কোম্পানির স্টিমার এসে নোঙর ফেলে টিয়ারঙের দ্বীপে। স্টিমার থেকে একে একে নেমে আসেন গোড়াসাহেব চ্যাটার্জিবাবু এবং আরো অনেকে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে তাঁরা দেখে নেন টিয়ারঙ দ্বীপকে, দ্বীপের বড় বড় মূল্যবান গাছ কেটে ব্যবসা করার সংকল্প করেন। গভীর কৌতূহলবশত টিয়ারঙের অধিবাসীরা তাঁদের সামনে এসে জড়ো হয়। গোরাসাহেব দ্বীপের বাচ্চা ছেলে মেয়েদের লজেন্স-বিস্কুট খেতে দেন, মেয়েদের কাঁচের জলচুড়ি উপহার দেন, জোয়ান পুরুষ মরদদের দিকে মুঠো মুঠো পয়সা ছড়িয়ে দেন। গোরা সাহেবের এই আন্তরিকতায় টিয়ারঙের অধিবাসীরা সকলেই মুগ্ধ হয় এবং তাঁর দলবল আন্তরিকতা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই টিয়ারঙের অধিবাসীদের মন জয় করে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই টিয়ারঙ একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়ে যায়। স্টিফেন্স কোম্পানির কাজকর্ম দেখাশোনার চাকরি নিয়ে উপস্থিত হন স্ত্রী ও শালিকা সহ চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবু এবং তাঁর বেকার ভাই সৌমেন। সৌমেন শিক্ষিত বেকার ছেলে, সে দাদার সঙ্গে এসেছে একটি চাকরির সন্ধানে। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগমনের ফলে আদিবাসী জনজীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়।

স্টিফেন্স কোম্পানির আগমনের পর টিয়ারঙীদের আদিম গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ জীবনে রোমাঞ্চ লাগে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই স্টিফেন্স কোম্পানির অধীনে শ্রমিকের কাজ পেয়ে যায়। পরিবর্তনের ঢেউ খেলে যায় তাদের জীবনে, টিয়ারঙ দ্বীপের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিও বদলে যেতে থাকে-

> “দিনে দিনে তৈরি হল স্টিমারঘাটা। ছোট ছোট কুঠরি তৈরি হল কয়েক সারি কুলিকামিন, মাল টানার যন্ত্রপাতি সব এসে পৌঁছাল। একটা ভাল দোকানও খুলে ফেলল ব্রিজলাল। একদিকে মদের দোকান, অন্য দিকে মনোহারী থেকে তৈজসপত্র সবকিছু।”[২]

স্বামীহারা ফিরুজার মনেও আনন্দের দোলা লাগে। ফিরুজা মদনাকে ভালোবাসে। সে চ্যাটার্জিবাবুর শ্যালিকা তামসীর কাছ থেকে চেয়ে তাই গায়ে আতর মাখে। শহুরে তামসীর মতোই সে সুন্দরী হয়ে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। প্রেমিক মদনার কাছে নিজেকে আরও সুন্দরী করে তোলার জন্য ফিরুজার চেষ্টার যেন বিরাম নেই। কোম্পানির কাজ করে সে যা মজুরি পায় তার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে জলে ভাসা সাবান কেনে। একদিন লোভ সংবরণ করতে না পেরে তামসীর দামি সিল্কের শাড়ি চুরি করে বসে। পরে অবশ্য সে মদিনার আপত্তিতে স্টিফেন্স কোম্পানির এল.ডব্লিউ.ও সমীরণের কাছে গিয়ে ওই শাড়িটি ফেরত দিয়ে দেয়। টিয়ারঙের অধিবাসীদের সঙ্গে ডিফেন্স কোম্পানির প্রথম দ্বন্দ্ব বাঁধে আগুনিয়া পর্বকে কেন্দ্র করে।

> "'আগুনিয়া' টিয়ারঙ অধিবাসীদের বহুদিনের পরব, টিয়ারঙের ধর্ম। এ সময়টায় বনের একটা অংশ বেছে নিয়ে খরগোশ বলি দিয়ে পুজো হয় প্রতি বছর। নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে খুঁটি গেড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় গাছে গাছে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন, লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।"[৩]

টিয়ারঙীদের পর্বের ধরন দেখে বিস্মৃত, স্তম্ভিত হয়ে যান চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবু থেকে শুরু করে স্টিফেন্স কোম্পানির সকল কর্মচারী –

> "একি করতে চলেছে এরা? দামী দামী গাছে এইভাবে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করতে চায়? সমস্ত বন যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার স্বপ্ন দেখে কোম্পানি-মহলের পত্তন করেছে স্টিফেন সাহেব, গ্যাংয়ের বানিয়েছে, বাংলো গড়েছে। যার লোভে ছুটে এসেছে তারা সেই বন পুড়িয়ে নষ্ট করতে চায় টিয়ারঙের অধিবাসীরা?"[৪]

এই দৃশ্য দেখে চ্যাটার্জিবাবু টিয়ারঙীদের এভাবে গাছে আগুন লাগাতে বারণ করেন। কিন্তু টিয়ারঙীদের সর্দার মাধো কোলাসো চ্যাটার্জিবাবুর এই নিষেধ মানতে নারাজ। মাধো সর্দার টিয়ারঙীদের আদেশ করেন বনের গাছে আগুন লাগিয়ে দিতে আর চ্যাটার্জিবাবু সঙ্গে সঙ্গে মাধো কোলাসোর বুকে গুলি চালিয়ে দিলেন। বুকে হাত দিয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাধো। এই ঘটনার পর সমস্ত টিয়ারঙীরা ভয় পেয়ে প্রাণ থাকতে থাকতে পালিয়ে গেল উৎসবের জায়গা থেকে। মাগো কোলাসোর হত্যার পর যেমন প্রতিক্রিয়া হওয়াটা উচিত ছিল, টিয়ারঙে তেমন কিছুই হল না। কোম্পানির কাজ পেয়ে টিয়ারঙীরা নতুন ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোম্পানির সাথে বিবাদ করলে রুজি-রুটিতে টান পড়বে। তাই তারা গত রাতের কথা ভুলে গিয়ে পরের দিন সকলেই কাজে হাজির হয়। শুধু মাধো কোলাসোর মেয়ে আকাশীর মনের মধ্যে একটা চাপা প্রতিশোধস্পৃহা চলতে থাকে। উপন্যাসের শেষে তাই আকাশীর হাতেই প্রাণ হারাতে হয়েছে চ্যাটার্জিকে।

'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' উপন্যাসটিতে বড় হয়ে উঠেছে আদিম এক বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কৌম জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব। ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদেরই অধীনে বেশ বড় মাপের চাকরি পেয়ে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা অংশ কেমন উন্নাসিক হয়ে উঠেছিল 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' উপন্যাসের চ্যাটার্জিবাবু তারই আদর্শ দৃষ্টান্ত। পরবের নামে টিয়ারঙীদের বনজ সম্পদ ধ্বংস করা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু তবুও এ কথা মেনে নিতে কোন অসুবিধা নেই যে মাধো কোলাসোকে গুলি করে মারার মধ্যে কোম্পানির চাকুরে চ্যাটার্জিরবাবুর কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটেছে। চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবুর কাছে মাধো কোলাসো মারা যাওয়া একটি ছোট্ট ঘটনা মাত্র। তাই কোম্পানির ওভারসিয়ার পাঠকবাবু মাধো কোলাসোর হত্যার ঘটনাটি স্টিফেন্স কোম্পানির সাহেবকে জানানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু অমিয়বাবু এই পরামর্শে কর্ণপাত না করে বলেন "না, না এসব ছোটখাটো খবর স্টিফেন্স সাহেবকে জানিয়ে কি হবে। ও সব ঠিক হয়ে যাবে দু-দিন গেলেই।"[৫] এখানে চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবু এঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতীভু। তাই কোম্পানির স্বার্থ দেখতে গিয়ে মাধো কোলাসোর মতো একটি আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে হত্যা করার মধ্যে তাঁরা কোনো অন্যায় দেখতে পান না। মাধো কোলাসোর মতো মানুষ এঁদের কাছে পশুতুল্য। শহুরে তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজের মানুষদের কী চোখে দেখে তা এই উপন্যাস পাঠে আমরা বুঝতে পারি।

আদিবাসী জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত রামাপদ চৌধুরীর অপর উপন্যাস হচ্ছে ‘অরণ্য আদিম’। প্রকাশকালের দিক থেকে না হলেও রচনাকালের দিক থেকে এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৮ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রচনার পটভূমি হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন–

> “সভ্য মানুষের পৃথিবীতে তখন ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যন্ত্রযুগের অভিনন্দন-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ভারতবর্ষের আকাশে তখন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে মোগল রাত্রির শেষ শুকতারা পাশ্চাত্যের যন্ত্রমূর্ছনার কাছে ম্লান হয়ে গেছে হারেমের রূপকণ্ঠির সুরগুঞ্জন। শাসন শোষণ খরস্রোতের অন্তরালে দেখা দিয়েছে এক নতুন জাগরণ।”[৬]

সভ্যতার আলো দেখে নি এরা। এহেন সমাজের মানুষদের কাজ ছিল জঙ্গল পরিষ্কার করা, পাথুরে মাটিতে কায়িক শ্রমিকের দ্বারা ধান, জেনার ফলানো। তাদের সমাজরীতি স্বশাসিত ও স্বনির্বাচিত। তারা রাজার খাজনা না দিয়ে রাজার হাতে তুলে দিয়েছে কায়িক পরিশ্রমে গড়ে তোলা কয়েক টুকরো জমি। তারা জন মানবহীন জায়গায় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের সভ্য জীবন থেকে সরিয়ে রাখত। অথচ আদিম অরণ্যচর লক্ষ লক্ষ মানুষ বন পুড়িয়ে জল ছিটিয়ে বীজ ঝরিয়ে ফসল ফলিয়েছে, গ্রাম বেধেছে সুখে। তারপর জমিদারের চোখ পড়েছে সে জমির উপর, চেয়েছে খাজনা। তারা খাজনা দেওয়া নাম শুনে গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে। অন্যত্র গিয়ে আবার গাসি মুন্ডার হুকুমে দীঘি পত্তন করেছে। নতুন ডিহির নাম হয়েছে গাসি মুন্ডার বউয়ের নামে।

> “গাসি মুন্ডার ঘর-গমকে অর্থাৎ গৃহিণী লাপ ডির নাম থেকে আস্তানাটার নাম হোক ‘লাপরা’।”[৭]

গ্রাম্য দেবতা সেরমা চাঁদোর স্বপ্ন নিয়ে সর্দার গাসি মুন্ডার আদেশে বুড়ো বটগাছটার নিচে প্রতিষ্ঠা করেছে মুন্ডাদের ভগবানকে।

সারনায় ভগবান প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করে। পঞ্চায়েত শাসনকে তারা কেউই উপেক্ষা করতে পারে না। তাদের অন্ধবিশ্বাস পঞ্চায়েত শাসন ও খাসি মুন্ডার নির্দেশ অমান্য করা পাপ- আদিম বনচর মানুষরা, তাই বিশ্বাস করে। তাই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে তাদের বিষাক্ত তীরের জোরে প্রতিরোধ করে একজোট হয়ে। কিন্তু তাদের সমাজেও আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ক্ষমতার লোভ। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় কাঠিদার (গ্রামপ্রধান) নির্বাচনকে ঘিরে। পাঁচ গ্রামের নেতা পানা মানকির সঙ্গে দলের সর্দার পঞ্চায়েত প্রধান গাসি মুন্ডার মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। পানা মানকির নির্দেশ মত আকুমের নাম বাদ দিয়ে গাসি মুন্ডার মনোমতো উধম বুড়াকে কাঠিদার নির্বাচন করা হলে তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গ্রাম্য রাজনীতি। তাই জারার উৎসবে অংশ নেয়নি পানা মানকি। গাসি মুন্ডার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে আকুম সুখনের মাধ্যমে। পঞ্চায়েত অপমানের জবাব দিতে চায় সুখেনকে উত্তেজিত করে। গাসি মুন্ডার সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তার মেয়ে রাঙ্গিনাকে প্রেম প্রস্তাবের জন্য মানকি প্ররোচিত করে সুখনকে। রাঙিনা সুখনের প্রেম-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মানকি সুখনকে বলেছে,

> “তুই একটা না মরদ জবাব দেবার পারলি নাই।”[৮]

সুখন বলে রাঙিনার কোমল মুখটার দিকে তাকালেই তার মনটা নরম হয়ে যায়। তাই সে রাঙিনাকে কিছু বলতে পারেনা। তখন পানা মানকি সুখনকে মেয়েদের বশ করার মন্ত্র বলে–

> “জবরদস্তি ধরম নষ্ট করতে হবে রাঙিনার। তারপর তার কাপড়টা কাড়ে এনে জ্বালায় এনে দিতে হবে সসানদিরির উপরে।”[৯]

পরিদের সত্য মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সুখনকে দিয়ে গাসি মুন্ডার সামাজিক শাসনে কালি লাগাতে চেয়েছে মানকি। মানকি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে গাসি মুন্ডার বিরুদ্ধে। আদিবাসী সমাজে এই গ্রাম্য দলাদলির পাশাপাশি তাদের জীবন নানা সংস্কার ও বিশ্বাসে পূর্ণ তাদের উৎসব ধর্মাচরণ বিশ্বাস সংস্কার এর খুঁটিনাটি নানান পরিচয় পাওয়া যায়। সেরমা চাঁদোর দেওয়া জমি জল তাদের জীবনের রসদ। মোরগ বলি দেয়, নতুন দিহিতে গাঁও দেহাতি সারানাকে প্রতিষ্ঠা করে বন পুড়িয়ে শুরু হয় জারার নৃত্য গান। জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদই তাদের রীতি, ধর্ম। হিন্দুদের মত নাহাল অর্থাৎ লাঙ্গল চালিয়ে চাস তাদের ধর্মবিরুদ্ধ।

"এতদিন তারা শুধু ক্ষেতি বানিয়েছে বন পুড়িয়ে, তারপর বসে বসে হাতে মাটির ঢেলা ভেঙেছে, সার দিয়েছে। কিন্তু নাহাল চালায় নি।"[১০]

যুগ যুগ ধরে লালিত অনার্য সংস্কার বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধারায় আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রজাগরণ। এই বন্য পরিবেশেই মানকি প্রথম যন্ত্রের আগমন ঘটায়। পরিবর্তিত হয়ে যায় তাদের স্বনির্বাচিত গ্রামীণ জীবন। লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা যাদের কাছে একদিন সমাজবিরুদ্ধ ছিল এই মানকি অভিশপ্ত ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে সোনার ফসল ভরিয়ে দিয়েছে। মেনে নিয়েছে যন্ত্রের সুফল। যন্ত্রের পর যন্ত্র যখন লাপড়ার কিছু দূরে কয়লাখনির সন্ধানে ব্যস্ত তখন কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রকে অভিশাপ মনে হলেও পরমুহূর্তে তাদের আপন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকার উদ্দেশ্য সেই বিশ্বাস ভাঙতে থাকে।

"ধীরে ধীরে নতুন করে জেগে উঠলো লাপরার কোলিয়ারী।"[১১]

এই যন্ত্রসভ্যতা তাদেরকে যেমন দিয়েছে অর্থ তেমনি কেড়ে নিয়েছে তাদের সারল্য, তাদের বিশ্বাস, তাদের সংস্কার। তাই আদিম অধিবাসীদের কাছে যন্ত্রসভ্যতা হচ্ছে বিষাক্ত সভ্যতা। আদিবাসী সমাজের যে নিয়ম-নীতি, আচার-নিষ্ঠা একুশ শতকের প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ কথা মানতেই হবে তারাই বাঁচিয়ে রেখেছিল অরণ্যের আদিমতাকে।

১৩৯৯ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডুবসাঁতার' উপন্যাসটিতে লেখক রমাপদ চৌধুরী মূলত দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের পার্থক্যের বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা দুর্গাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মানসিকতার পরিবর্তন এখানে ফুটে উঠেছে। এই মূল কাহিনির পাশাপাশি সুনির্মল-নন্দিতা-অনুপম, বকুল-অনিন্দিতা, অভিজিৎ-উর্মিলা-শান্তনু এবং সবশেষে অবহেলিত এক আদিবাসী বালকের উপকাহিনি স্থান পেয়েছে। সুনির্মল, বকুল, অভিজিৎ সবাই নিজের সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত। সন্তানদের বড় করার তাগিদে তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি মা-বাবা চাইছে তাদের সন্তানই যেন প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। এটা যেন একটা যুদ্ধ জয় করার মতো। এই আলোচনার পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এক আদিবাসী অনাথ বালক জোশেফ সরেনের প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। সুনির্মল, বকুল, অভিজিৎ-এর সন্তানরা যে স্কুলে পড়ে জোশেফও সেই একই স্কুলের ছাত্র। তবে ক্লাসে জোশেফদের স্থান হয় একেবারে শেষ বেঞ্চে। ক্লাসের অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের এদের প্রতি যেমন আগ্রহ নেই, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছেও এরা উপেক্ষিত। উপন্যাসের কাহিনিসূত্রে জানা যায় জোশেফ এই স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল কেবল ছোটনাগপুরের জনৈক পাদ্রীর জন্য। স্কুলের যখন ভগ্নদশা তখন সেই পাদ্রী কিছু ডোনেশন জোগাড় করে স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং শর্ত রেখেছিলেন আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতি ক্লাসে একটি করে সিট রিজার্ভ রাখতে হবে। ওরা সেখানে বিনা পয়সায় পড়বে এবং স্কুল বোর্ডিং-এ থাকবে। জোশেফ সরেন সেরকম এক ছাত্র।

পুজোর সময় প্রায় একমাস স্কুল ছুটি। অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েরা এই সময় বাবা মা'র সাথে দূরে কোথাও বেড়াতে যায়। কিন্তু আদিবাসী এই ছেলেটিকে পুজোর ছুটিতেও স্কুলের বোর্ডিং হাউসেই থাকতে হয়। সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে জোশেফ প্রতিমা বিসর্জন দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি নৌকা থেকে একটি বালক পড়ে যায়। ডুবন্ত এই বালকটিকে উদ্ধার করবার জন্য কাউকেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় না। একজন মাঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সে খুঁজে পেল না বাচ্চাটিকে। শেষ অবধি জোশেফ কোনো কিছু না ভেবেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারবার ডুবসাঁতার দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সে ডুবে যাওয়া বাচ্চাটিকে খুঁজে পায় এবং টানতে টানতে তাকে নদীর কিনারায় নিয়ে আসে। একটি দশ বছরের ছেলেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো বারো বছর বয়সের কলোকুলো এক তুচ্ছ আদিবাসী বালক। পরের দিন জোশেফেরে সাহসিকতার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পরল। যে জোশেফ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেও উপেক্ষিত ছিল, সেই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস এখন বলছেন –

"আমাদের স্কুলের গর্ব, 'এতদিনে সত্যি সত্যি গর্ব করার মত কিছু করেছে এই স্কুলেরই একজন'।"[১২]

জোশেফের এই দুঃসাহসিক কর্মের জন্য তাকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। দিল্লি নিয়ে গিয়ে জোশেফের মতো আরও দশ-বারোজন ছেলেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। নন্দিতা-তনু-বকুল-উর্মিলা যখন নিজেদের সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল সেই সময় জোশেফের এই সংবাদ তাদেরকেও আনন্দিত করে। সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির

বক্তৃতার শেষ বাক্যটি ছিল “দ্য নোবলেস্ট ম্যান ইজ হি হু সেভস দ্য লাইফ অফ অ্যানাদার ম্যান।”[১৩] এতক্ষণ পর্যন্ত একের সন্তানের সাফল্য অন্যের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সাধারন আদিবাসী অবহেলিত বালক জোশেফের সাফল্য তাদের সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সন্তানের উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের থেকে অনেক বড় গর্বের বিষয় মানবিক মূল্যবোধ।

সমাজে এই অবহেলিত আদিবাসী সমাজের প্রতি উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতার ছবি যেমন এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তেমনি সহজ-সরল এক আদিবাসী বালকের জীবনকে তুচ্ছ করে পরোপকার করার মনোবৃত্তিও পরিলক্ষিত হয়। তার উপকার করার মনোবৃত্তির জন্যই উপন্যাস শেষে সকলে জোশেফ সরেনের কৃতিত্বে গর্ববোধ করেছে। রাতারাতি সে হয়ে উঠেছে ‘আমাদের জোশেফ সরেন’। তাই উপন্যাসের প্রসঙ্গ কথায় লেখক জানিয়েছেন-

> “চুনী কোটালের দেশে এ ঘটনাও ঘটে, যদি সে গর্ব এনে দেয়। স্কুলের কিংবা দেশের। তেনজিং যখন এভারেস্ট আরোহন করে তখন ‘আমাদের তেনজিং’। তীরন্দাজ লিম্বারাম অলিম্পিকে যদি সোনা আনতে পারত তা হলে হয়ে উঠত ‘আমাদের লিম্বারাম’। ”[১৪]

উপসংহার: আদিবাসী সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসগুলোয় আদিবাসী মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং তাদের দুঃখ কষ্টের কাহিনি প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উচ্চবিত্তের আগ্রাসনের ফলে প্রান্তিক মানুষদের ভূমি বেদখল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষনের ছবিও ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন। অন্ত্যজ-আদিবাসীকেন্দ্রিক এই উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণে তাদের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার আদিবাসীন্দা যারা তারাই উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিনিয়ত অবহেলিত হচ্ছে, যার ফলে সভ্যতার আলো তাদের কাছে দুর অস্ত, প্রকৃতির সঙ্গে নিহত সংগ্রাম করে অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের জীবন কাটে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে প্রাচীন সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে তাদের জীবন বাঁধা। উপন্যাসগুলো পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতির পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক দিকটিও উদ্ঘাটনের প্রয়াস করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) চৌধুরী, রমাপদ, গদ্য সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৩২-১৩৩।
২) চৌধুরী, রমাপদ, দ্বীপের নাম টিয়ারঙ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৫, পৃষ্ঠা- ৬৭।
৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।
৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।
৬) চৌধুরী, রমাপদ, অরণ্য আদিম, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা- ০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৪, পৃষ্ঠা- ০১।
৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ০৭।
৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০।
৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১।
১০) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬।
১১) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০।
১২) চৌধুরী, রমাপদ, ডুবসাঁতার, উপন্যাস সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৫০৬।
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০৭।
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) অধিকারী, নীহার শুভ্র, গল্পের ভুবন রমাপদ চৌধুরী, পুনশ্চ, কলকাতা- ১০, প্রথম প্রকাশ- ২০১৮।

২) ঘোষাল, শুক্লা (সম্পাদনা), বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০১১।

৩) চৌধুরী, রমাপদ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৫।

৪) চৌধুরী, রমাপদ, উপন্যাস সমগ্র (পঞ্চম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৯৯৪।

৫) চৌধুরী, রমাপদ, অরণ্য আদিম, ডি. এম.লাইব্রেরী, কলকাতা -০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৪।

৬) চৌধুরী, রমাপদ, গদ্য সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১১ ।

৭) চৌধুরী, শম্পা , রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১০।

৮) দেব, দূর্বা, সাহিত্যে নারী নির্মাণ ও নৈপুণ্যে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭।

৯) পাল, মৌসুমী, রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প: বিষয় ও রূপরীতি, অক্ষর পাবলিকেশানস্, ত্রিপুরা- ০১, প্রথম প্রকাশ- ২০১৫।

১০) পুরকাইত, উত্তম (সম্পাদনা), রমাপদ চৌধুরী বৈচিত্র ও অনুসন্ধান, উজাগর প্রকাশন, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০১৯।

১১) বন্দোপাধ্যায়, রুমা, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ - ২০২৩।

১২) ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৪।

১৩) ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ (সম্পাদনা), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৯৯৮।

১৪) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪।